Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলকাপনাট্যের পরিবেশনারীতি

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লায়লা ফেরদৌস হিমেল
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.8
Pages	১৬৯-১৯৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আলকাপনাট্যের পরিবেশনারীতি

লায়লা ফেরদৌস হিমেল*

সারসংক্ষেপ: বাংলা লোকনাট্যধারার একটি বিশিষ্ট শাখা আলকাপনাট্য। এটি একটি দলীয় ও মিশ্র প্রকৃতির নাট্যগীতি প্রদর্শন। বাংলাদেশের রাজশাহী, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহ অঞ্চলে এর প্রচলন বেশি। বর্তমান প্রবন্ধে আলকাপনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ-প্রকরণ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

'আলকাপ' শব্দটি আরবি শব্দজাত। আরবি 'আলকাব' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি বলে বিশেষজ্ঞের ধারণা। (মাজহারুল, ২০০০ : ভূমিকা) যদিও 'আল' ও 'কাপ' শব্দ দুটি বাংলা শব্দের অন্তর্গত। 'আল' শব্দটি বাংলা তীক্ষ্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'কাপ' প্রসঙ্গে জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গলে* উল্লেখ আছে–

> কাপ লৈয়া আল্য যদ দেবতা গন্ধর্ব্ব।
> নীলাচলে জন্ম যাত্রা জগন্নাথের পর্ব্ব। (সেলিম, ২০১০ : ৩৭-৩৮)

ধারণা করা হয়, কাপ শব্দটির সঙ্গে পরবর্তীকালে 'আলকাটা' শব্দ যুক্ত হয়ে 'আলকাপ' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ মস্করা, রঙ বা কৌতুক। এর পরিবেশনাতেও রঙের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মোনা কষার বোনা কানা নামক জনৈক ব্যক্তি এই নাট্যের বর্তমান রূপ দেন বলে বিশেষজ্ঞের ধারণা। (তাসাদ্দক, ১৯৯৪ : ৩৬-৩৭) অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্বেই আলকাপনাট্য বর্তমান রূপ লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে আলকাপনাট্য যে রীতিতে পরিবেশিত সেখানে মধ্যযুগের প্রভাব পরিদৃশ্যমান। মধ্যযুগের নাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেব-বন্দনার মধ্য দিয়ে আখ্যানের পরিবেশনা শুরু করা। আধুনিক নাট্য পরিবেশনায় যে বিষয়টিকে খানিকটা অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্যের পরিবেশনায় আজো এ রীতি স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। আলকাপনাট্যের পরিবেশনা শুরু হয় জয়-বন্দনা দিয়ে এবং হরিনাম

*প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।

উচ্চারণের মধ্যদিয়েই শেষ হয় এর পরিবেশনা। মাঠ পর্যায়ের জরিপ ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক আলকাপের পরিবেশনা জুড়ে একাধিক বন্দনাগীত পরিবেশিত হবার দৃষ্টান্ত লভ্য।

বিশেষজ্ঞের মতে, আলকাপনাট্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের একক রচনা নয়। এটি সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। শিক্ষিত সমাজের বাইরে যে লোকায়ত জনজীবন, তার ভেতর থেকেই আলকাপনাট্যের উদ্ভব। (হাবিবুর, ১৯৮২ : ১১৫-১১৮) পরিবেশনা রীতির বিচারে বলা যায়, আলকাপ একটি সরল শিল্পমাধ্যম, যার ভাষা জনগণের কথিত ভাষা এবং যা মূলত গীতিপ্রধান ও নৃত্যবহুল। এর পরিবেশনায় লোকজ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। অভিনেতারা ভারী মেকআপ নেয়। সাথে থাকে বাহারি রঙের পোশাক। আলোচনার সুবিধার্থে আলকাপনাট্যের পরিবেশনারীতিকে নয়টি পর্বে ভাগ করা যায় :

১। অনুষ্ঠানের সময়, ২। মঞ্চ বা আসর, ৩। আলো, ৪। মেক আপ, ৫। পোশাক, ৬। বাদ্যযন্ত্র, ৭। অভিনয় উপকরণ বা প্রপ্‌স, ৮। আসন বিন্যাস, ৯। নাট্য পরিবেশনা, ৯.১ : আসন গ্রহণ, ৯.২ : কনসার্ট, ৯.৩ : জয়বন্দনা, ৯.৪ : আসরবন্দনা, ৯.৫ : দেশবন্দনা, ৯.৬ : ছোকরা নৃত্য, ৯.৭ : নটরাজ নৃত্য, ৯.৮ : খ্যামটা, ৯.৯ : ফার্স বা দ্বৈত সংগীত, ৯.১০ : ছড়াবন্দনা, ৯.১১ : মূল আখ্যানের পরিবেশন, ৯.১২ : গোবিন্দ নাম উচ্চারণ বা পরিসমাপ্তি।

উল্লিখিত শ্রেণিকরণের ধারায় আলকাপনাট্যের পরিবেশনারীতির কাঠামোগত রূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানের সময়

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য বছরের যেকোনো সময় আলকাপনাট্যের আয়োজন করে থাকে। নির্দিষ্ট কোনো একটি উৎসব বা পার্বণের সাথে জড়িয়ে নেই এ পালা পরিবেশনের ইতিহাস। তবে কিছু উৎসব-পার্বণ রয়েছে, যেখানে আলকাপনাট্য পরিবেশন যেন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এ ধরনের উৎসব-পার্বণের মধ্যে আছে গ্রাম বাংলার পুজোৎসব, নবান্ন উৎসব, বিবাহ উৎসব, নাট্যোৎসব, ঈদ উৎসব প্রভৃতি। আলকাপ এমনই এক নাট্যআঙ্গিক যা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। এর চাহিদা পুজোৎসবেও যেমন, ঈদ উৎসবেও ঠিক তেমনি। তাই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত সব ঋতুতেই কম বেশি আলকাপনাট্যের আসর বসতে দেখা যায়। সাধারণত সূর্যাস্তের পর আলকাপনাট্যের পরিবেশনা শুরু হয়। কখনো দুঘণ্টা, কখনো তিন ঘণ্টা, কখনও বা সারারাত ধরে অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আলকাপনাট্য পরিবেশনের দৃষ্টান্ত লভ্য।

মঞ্চ বা আসর

আলকাপ খোলা মঞ্চে পরিবেশিত হয়। কখনো তা হয় বৃত্তাকার ক্ষেত্র আবার কখনও-বা চৌকোণ। তবে, নির্দিষ্ট কোনো মঞ্চক্ষেত্রের মাঝে এর অভিনয়শৈলী সীমাবদ্ধ থাকে না। অভিনেতার সুদক্ষ অভিনয়-কৌশল তাকে বারবার টেনে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট মঞ্চসীমার বাইরে।

অভিনয় করতে করতে অভিনেতা কখনো মিশে যায় দর্শকদের মাঝে। আবার এমনও হয়েছে যে, দর্শক ভেবে দীর্ঘক্ষণ যার পাশে বসে জমিয়ে উপভোগ করছিলাম পালা, হঠাৎ দেখি সেও উঠে গিয়ে অভিনয় শুরু করেছে।

উক্ত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আলকাপের পরিবেশনা নির্দিষ্ট কোন মঞ্চক্ষেত্রে সম্ভব নয়। পরিবেশনের সরস ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে, আলকাপনাট্যের উপস্থাপন ভূমি সমতল বৃত্তাকার বা চৌকোণ খোলা মঞ্চে হওয়াই শ্রেয়।

রাজশাহী জেলার অধিকাংশ গ্রামে এখনো ভূমি-সমতল চারদিকে দর্শকবেষ্টিত আসরে আলকাপনাট্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে, কখনও কখনও সমতল ভূমির উপরে চৌকি পেতে এক থেকে দুফুট উঁচু করে আলকাপের মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চের কাছে চারদিকে পাটি বা খড় বিছিয়ে এবং একটু পেছনের দিকে চেয়ার বা বেঞ্চ পেতে তৈরি করা হয় দর্শকের বসার স্থান। মঞ্চের উপরে শামিয়ানা বা টিনের ছাউনি দেওয়ার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় মাঠপর্যায়ের জরিপে। এছাড়া বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে সৃজিত মঞ্চ বা মিলনায়তনের মঞ্চেও আলকাপ পালা পরিবেশনের দৃষ্টান্ত লভ্য।

আলো

আলকাপনাট্যের বীজ বা মূল বিষয় সুনির্দিষ্ট থাকলেও কাহিনি-বিন্যাস, নাট্যসংলাপ, সংগীত, ছড়াবন্দনা এমনকি অভিনেতাদের মঞ্চে আগমন ও প্রস্থানের সময়, স্থান এ সবকিছুই নির্ভর করে সরকার ও অভিনেতাদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ওপর। কোন পালার পরে কোন পালা পরিবেশিত হবে সে সম্পর্কে সরকারের কোনো পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না। তাই যিনি অভিনয় করবেন তিনি জানেন না কখন বা কোন সংলাপের পর কোনদিক থেকে তাকে মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে অথবা মঞ্চে কোন কোন অংশে সম্পন্ন হবে তার অভিনয় কার্যটি। তাই পূর্বনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট কোনো আলোক পরিকল্পনা আলকাপে সম্ভব নয়। দিনের বেলা সূর্যের আলোতে এবং রাতে বৈদ্যুতিক বাতির নিচে অর্থাৎ ফ্ল্যাড লাইটেই ক্ষেত্র বিশেষে আলকাপ পরিবেশিত হয়। সেক্ষেত্রে ১০০, ২০০ বা ৫০০ ওয়াটের বাল্ব কিংবা হ্যালোজেন বাতি ব্যবহার করা হয়। তবে, যেখানে বিদ্যুৎ থাকে না, সেখানে সাহায্য নেয়া হয় হ্যাজাকের আলো বা জেনারেটরের।

মেকআপ

মাঠ পর্যায়ে একাধিক আলকাপনাট্যের পরিবেশনা প্রত্যক্ষণসূত্রে বলা যায়, প্রচলিত নাট্যমঞ্চের মতো আলকাপনাট্যমঞ্চের সাথে গ্রিনরুম বা সাজঘরের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তাই অভিনেতারা মঞ্চ সংশ্লিষ্ট কোনো বাড়ির বারান্দা বা ঘরকেই বেছে নেন সাজঘর হিসেবে। এ ধরনের সাজঘরের ব্যবস্থা করে দেন আয়োজকবৃন্দ।

ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্যের বহুস্থলে পুরুষ কর্তৃক রমণীর আহার্য বা রূপসজ্জা গ্রহণ পূর্বক নাট্যাভিনয়ে লিপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত লভ্য। (সেলিম, ২০১০ : ৩২৯) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে 'অদ্ভুত গোপিকা নৃত্যে'র উল্লেখ রয়েছে –

অদ্ভুত গোপিকা নৃত্য চারি বেদ ধন।

চৈতন্যদেব স্বয়ং গোপিকা বেশ ধারণ করে উক্ত লীলানাট্যে অভিনয় করেছিলেন বলে বিশেষজ্ঞের ধারণা। (সেলিম, ২০১০ : ১৭) আলকাপনাট্যের পরিবেশনাতেও এ ধারা লক্ষণীয়। আলকাপনাট্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এতে ছেলেরাই ছেলে ও মেয়ে উভয় চরিত্রে অভিনয় করে। তাই মেকআপ বা সাজ-সজ্জার বিষয়টি এতে খুবই গুরুত্ব পায়।

মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে আলকাপের সকল অভিনেতাই প্রথমে জিংক অক্সাইড ও সিঁদুর খানিকটা পুকুরের পানিতে মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি মুখে লাগায়। মেকআপের এই অংশকে বলা হয় 'বেইজ মেকআপ'।[১] এবার পুরুষ চরিত্রের অভিনেতারা হালকা কাজল ও লিপ লাইনের সাহায্যে চোখ ও ঠোঁট এঁকে নেয়। আর যারা নারী চরিত্রে অভিনয় করবেন, তারা শুরু করে চরিত্রানুগ মেকআপ।

আলকাটনাট্যের মূল রস 'শৃঙ্গার'।[২] তাই অভিনেতারা মেকআপের ক্ষেত্রে একটু চড়া রঙই বেছে নেয়। তারা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড় করে ঠোঁট এঁকে তাতে লাগায় গাঢ় লাল রঙের লিপস্টিক। হাতে থাকে লাল ও সোনালি চুড়ি। মাথায় থাকে নকল চুল। সে চুলের কোনোটি থাকে পুরোপুরি উন্মুক্ত, আবার কোনোটি থাকে উচুঁ করে খোঁপা করা। খোঁপায় লাগায় বাহারি রঙের ফুল। নারীবেশী পুরুষ অভিনেতাকে বলা হয় 'ছোকরা'। (সুরেশচন্দ্র, ২০৯ : ১৩০ : ১৩৫)

আলকাপের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, এতে ছেলেরাই ছেলে ও মেয়ে উভয় চরিত্রে অভিনয় করে। তাই মেকআপ বা সাজ-সজ্জার বিষয়টি এতে খুবই গুরুত্ব পায়। মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে পুরুষ অভিনেতা নারী চরিত্রে অভিনয়ের নিমিত্তে নারী-রূপ ধারণের জন্য উজ্জ্বল ভারি মেকআপ গ্রহণ করেন।

নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে প্রত্যেক ছোকরাই কানে ও গলায় পরে অলংকার। এই অলংকারগুলো তারা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। প্রথমে তারা বিভিন্ন রঙের চুমকি

বসায় চওড়া লেইসের উপরে। এবার চুমকি দিয়েই তৈরি করে লকেট ও কানের দুল। চোখের উপরে ও গালে লাল রঙের শেড ব্যবহার করে এবং টেনে কাজল পরে চোখে। নাকে থাকে বড় নাকফুল।

পোশাক

আলকাপনাট্যের অভিনেতাবৃন্দ নিজ নিজ চরিত্রের সাথে মানানসই বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করেন। যেমন জামাই, মামা বা ভাই চরিত্রে যারা অভিনয় করেন, তারা ধুতি পরেন। তাদের ধুতি পরার স্টাইলটি একটু ভিন্ন। ধুতি পরার জন্য নির্ধারিত কাপড়ের অর্ধেক অংশ দিয়ে তারা ধুতি পরার কাজটি সম্পন্ন করে বাকি অর্ধেক অংশ পেঁচিয়ে কোমরের সাথে বেঁধে রাখেন। কাপড়ের এই অর্ধাংশ পরবর্তী সময়ে অভিনয়ের প্রয়োজনে প্রপ্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুপায়ের মাঝ দিয়ে টেনে কখনো একে বানানো হয় ঘোড়া, আবার টান দিয়ে এনে কপালে পেঁচিয়ে বানানো হয় মাথার মুকুট। শরীরের উপরের অংশে থাকে হালকা শার্ট বা ফতুয়া। বয়স্ক মোড়ল পরেন লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। শহরের মেম্বার বা ওয়ার্ড কমিশনার পরেন প্যান্ট ও শার্ট। সাপুড়ে চরিত্রে যিনি অভিনয় করেন, তিনি ধুতির উপরে পরেন ফতুয়া।

পালায় যারা নারী চরিত্রে অভিনয় করেন, তারা শাড়ি পরেন কুঁচি দিয়ে। শাড়ির সাথে থাকে ম্যাচ করা ব্লাউজ। শাড়িতে যে ফুল তোলা থাকে, ব্লাউজে থাকে তার অংশবিশেষ। শাড়ি ও ব্লাউজের ফুলগুলো তারা নিজ হাতে সুঁই-সুতোয় গাঁথে।

মূলত অনেক কমদামি কাপড় তারা শাড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। কাপড়গুলোর রঙ হয় উজ্জ্বল কমলা, হলুদ বা লাল। উজ্জ্বল শাড়ির উপরে উজ্জ্বল জরির কাজ আলকাপের দর্শকদের চোখে এক ঝলকানো আভা তৈরি করে।

নারীবেশী ছোকরাদের কেউ কেউ মাথায় ওড়না ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে ওড়নার মাঝখানের অংশটি কেবল মাথার খোপার সাথে লাগান থাকে। আর বাকি অংশ থাকে উন্মুক্ত, যা কখনোই সচরাচর প্রথা মেনে তাদের বুক আবৃত করে না।

আলকাপের অভিনেতারা শাড়ির নিচে বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরিধান করেন, যা পেটিকোট হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মূলত তা তৈরি করা হয় লেহেঙ্গোর আদলে। পেটিকোটের মতো এতে সুতি কাপড় ব্যবহৃত হয় না। এটি তৈরি করা হয় সিনথেটিক কাপড় দিয়ে। যার নিচের অংশে আলাদা কাপড়ের বড় বড় কুঁচি দেয়া থাকে। নাচের সময় ছোকরারা মাঝে মাঝে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য শাড়ি খুলে ফেলে। তখন কোমর পর্যন্ত নকশীকরা ব্লাউজ ও লেহেঙ্গার আদলে তৈরি পেটিকোট চোলি-ঘাগরার কাজ করে।

আদি ভাব-রসাত্মক নাট্য আলকাপ। আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এতে নেই বললেই চলে। একবিংশ শতাব্দীর এই পর্বে এসেও আলকাপ পরিবেশিত হয় হারমনিয়াম, ডুগি, তবলা, ঢোল, খোল, মন্দিরা, ঘুঙুর ও জুড়ির সঙ্গতে। সর্প বিষয়ক আলকাপ পর্বে সাপুড়ের হাতে প্রপ্স হিসেবে একটি বীন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আলকাপে মুলত কোন ধরনের বাঁশি ব্যবহৃত হয় না। হারমনিয়ামের সপ্ত-স্বরেই মুর্ত হয়ে উঠে বাঁশির সুর। কখনো তা হাস্যরস তৈরি করে, কখনো করুণ সুর। তবে, আলকাপনাট্যে করুণ রসের মাঝেও লুকিয়ে থাকে হাস্যরসের বীজ।

আলকাপনাট্যের পরিবেশনায় দুজন বাদকের হাতে দুটি হারমনিয়াম থাকে। দুজোড়া তবলা অর্থাৎ দুটি বায়া ও দুটি ডুগি নিয়ে বসেন দুজন তবলা বাদক। একটি বা কখনো একজোড়া ঘুঙুর থাকে একজন বাদকের হাতে। দুজন ঢুলি বাজায় দুটি ঢোল। একজন বায়েন বাজায় খোল। আর বাকি তিন-চার জন বসে যায় জুড়ি নিয়ে।

অভিনয় উপকরণ বা প্রপ্স

অভিনয়কে অর্থবহ করার জন্য আলকাপনাট্যের পরিবেশনায় যে ধরনের দ্রব্যসামগ্রী বা প্রপ্স ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম দুটি প্রপ্স হলো কোমরে প্যাঁচানো গামছা ও ধুতির বর্ধিতাংশ। লক্ষ করার বিষয় পোশাক-পরিচ্ছদ হিসেবে পরিহিত ধুতি বা গামছাও অভিনয় কালে অভিনয়ের অনুষঙ্গ (প্রপ্স) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা লৌকিক নাট্যাভিনয়রীতির এই কৌশলটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ছাড়া অভিনয়ের প্রয়োজনে বদনা, লাঠি, বই, খাতা, কলম, চপ্পল, শাড়ির আঁচল, সাপ ধরার বীন প্রভৃতিও প্রপ্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে মাঠপর্যায়ের জরিপে।

আসন বিন্যাস

আলকাপনাট্যে মঞ্চে বাদকদল ও দোহারবৃন্দ একই সাথে আসন গ্রহণ করেন। তবে তাদের বসার ধরনটি একটু ভিন্ন হয়। যেমন বাদকদল বসেন মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত স্থানের পেছনে একটি বা দুটি অর্ধবৃত্তাকার রেখায়। আর তার ঠিক সামনে বৃত্তাকার চক্রের মধ্যে বসেন দোহারগণ। অভিনেতারাও এই বৃত্তকার চক্রে এসে যুক্ত হন পরবর্তী সময়ে। মঞ্চের চারদিকে ঘিরে বসে থাকে উৎসুক দর্শক। গোলাকার বা চৌকোণ মঞ্চের চারদিক বেষ্টন করে আলকাপ পালা পরিবেশিত হয়।

ক. জুড়ি বাদক - চারজন

খ. তবলা বাদক - দুজন

গ. ঢোল বাদক - একজন

ঘ. খোল বাদক - একজন

ঙ. মন্দিরা বাদক - এক বা দুজন
চ. হারমনিয়াম বাদক - এক থেকে দুজন
ছ. ঘুঙুর বাদক - একজন
দ. দর্শকবৃন্দ - অনির্দিষ্ট
জ. অভিনেতা - ছয়জন
ঝ. দোহার - চারজন
ঞ. সরকার - একজন

নাট্য পরিবেশনা

আলকাপনাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রথমেই ধারার মদন বা সরকার দলের দোহার ও বায়েনদের নিয়ে মঞ্চের পেছনের দিকে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে আসন গ্রহণ করেন। এ সময় তারা কখনো দাদরা, কখনো খ্যামটা তাল বাজিয়ে দর্শকমনে তৈরি করেন আলকাপনাট্য পরিবেশনের এক লীলাময় আবেশ। এবার তবলা ও জুড়ির সাথে যুক্ত হয় হারমনিয়াম। অন্যদিকে চলতে থাকে অভিনেতাদের সাজ-সজ্জার পালা।

সাজ-গোজ শেষ করে অভিনেতারা যখন সাজঘর থেকে মঞ্চের দিকে রওনা হন, ততক্ষণে মঞ্চের চারদিক ভরে যায় উৎসুক দর্শকে। উপস্থিক দর্শকবৃন্দ করতালির মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানায়। মধ্যযুগের বাংলা নাট্যাভিনয়ে সাজঘর থেকে মঞ্চস্থলে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অভিনেতা কর্তৃক নিজ চরিত্রের পরিচয়জ্ঞাপক পোশাক-পরিচ্ছদ আবরণবস্ত্র বা অন্তঃপট দ্বারা আবৃত করে রাখার দৃষ্টান্ত লভ্য। পরবর্তী সময়ে যাত্রা নাটক এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের লীলানাট্যের পরিবেশনায়ও এই অন্তঃপট ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।[৩] আলকাপনাট্যের পরিবেশনায় মধ্যযুগের বাংলানাট্য পরিবেশনার প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও এই নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে অন্তঃপট ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লভ্য নয়। আলকাপনাট্য পরিবেশনায় অভিনেতারা নিজ চরিত্রের পরিচয়জ্ঞাপক পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা সহকারেই সাজঘর থেকে মঞ্চস্থলের দিকে রওনা হয়। এই সময় নারীবেশী পুরুষ অভিনেতারা নারী সুলভ বিভিন্ন ছলাকলা প্রদর্শন করে দর্শক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে।

নারীবেশী পুরুষ অভিনেতা বা ছোকরাগণ পায়ে নূপুর পরেন। হাতে থাকে রেশমি চুড়ি। নূপুর পরিহিত ছোকরাদের সম্মিলিত পদক্ষেপ, হাতে রেশমি চুড়ির ছন্দ এবং এঁকে-বেঁকে চলা, কখনো ঠোঁটের কোনে মুচকি হাসি ও দর্শকের করতালি সব মিলিয়ে এক উদ্দীপক সংগীত বাজতে থাকে আসর ঘিরে। ছোকরাদের কেউ কেউ মেয়েদের মতো করে বুকের কাপড় টেনে নেয়, কেউ অন্যের খোঁপায় ফুল গুঁজে দেয়,

কেউ আবার অন্য পুরুষদের সাথে রঙ্গ-তামাশা শুরু করে। অন্যদিকে মঞ্চে বেজেই চলে কখনো দাদ্‌রা, কখনো খ্যামটা। এ যেন নৃত্য না হলেও নৃত্যের সামিল।

আসন গ্রহণ

প্রত্যেক অভিনেতাই মঞ্চে ওঠার আগে মঞ্চ ছুঁয়ে প্রণাম করে নেয়। এবার ধারার মদন, দোহারগণ এবং নবীন অভিনেতা প্রবীণ অভিনেতাকে প্রণাম করে দোহার বৃত্তের মাঝে ঢুকে পড়ে। বায়েনদের দিকে সামনে ও দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে বসে তারা।

কনসার্ট

আসন গ্রহণ শেষ হলে শুরু হয় সম্মিলিত বাদন বা কনসার্ট। কনসার্ট পরিবেশিত হয় দুটি পর্বে বিভক্ত হয়ে। প্রথম পর্বের কনসার্টে বাদকদল প্রথমে হারমনিয়ামে পরিচিত কোন গানের সুর তোলে। এর সাথে শুরু হয় তবলার বোল। ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয় খোল, জুড়ি, ঘুঙুর ও মন্দিরা। প্রথম পর্বের কনসার্টে ব্যবহৃত গানের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি নজরুল সঙ্গীত হলো :

নাচ ময়ূরী নাচ রে
রুম ঝুমাঝুম নাচ রে
ঐ এলো আকাশ ছেয়ে
বর্ষা রানীর সাজ রে।

এই কনসার্টের মিউজিক প্রথমে ধীরলয়ে বাজে, তারপর দ্বিগুণ ও পরে চৌগুণে বাজতে থাকে। অনেকক্ষণ চৌগুণে বাজার পর তা আবার দ্বিগুণে ও পরে প্রথম লয়ে ফিরে এসে শেষ হয় প্রথম পর্বের কনসার্ট।

দ্বিতীয় পর্বের কনসার্টে বাজনার সাথে যুক্ত হয় অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর। এ পর্বে বাদকগণ নির্দিষ্ট একটি বাজনা বাজায়। সাথে দোহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :-

ওরে ও... ও... ও... ও...

তালের নাম : কাহারবা

তবলার বোল :

+				০				+
ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না	ধা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১

সুর, ছন্দ ও বোল মিলিয়ে তৈরি স্বরলিপি :-

+				০				+
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না	
পা	০	মাপা	গামা	পাসা	০-া	০-া	০-া	
ও	০	রে	০	ও	০	০	০	

+				০				+
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না	
-া	-া	-া	-া	না	-া	-া	-া	
০	০	০	০	০	০	০	০	

+				০				+
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না	
-া	-া	ধা	না	ধাপা	-া	-া	-া	
০	০	ও	০	ও	০	০	০	

+				০				+
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	না	ধা
-া	-া	-া	-া	মা	না	ধা	পা	পা
০	০	ও	০	বাহা	বাহা	বাহা	বাহা	ও

কখনও কখনও এই বাহা! বাহা! বাহা! অংশটি খুব প্রলম্বিত সুরে গাওয়া হয়। আর এভাবেই শেষ হয় দ্বিতীয় পর্বের কনসার্ট। এরপর শুরু হয় বন্দনাপর্ব। ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্যের পরিবেশনায় বন্দনাগীত পরিবেশনার ধারা সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে এই শ্রেণির গীতের প্রভাব কেবলমাত্র বাংলানাট্যের পরিবেশনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃত, হিন্দি, ফার্সি ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য ভাষায় রচিত নাট্যের পরিবেশনায়ও এ ধারার অনুবর্তনের প্রমাণ লভ্য।

(সেলিম, ২০১০ : ভূমিকা) তবে তুলনামূলক বিচারে বলা যায় আদি ও মধ্যযুগের নাট্য পরিবেশনায় এই বন্দনাপর্বের প্রয়োগ অধিক পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক নাট্য পরিবেশনের ধারায় এর প্রয়োগের মাত্রা ক্ষীণ হয়ে এসেছে বলেই বিশেষজ্ঞের ধারণা। (গোপাল, ১৯৭৪ : ৮০) তবে আলকাপনাট্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে বন্দনাগীত পরিবেশনের রীতি সূচনালগ্নে যেমন ছিল, বর্তমান সময়েও ঠিক তেমনি আছে। এগুলোর মধ্যে জয়বন্দনা, আসরবন্দনা, দেশবন্দনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জয়বন্দনা

'নাটক' শব্দটির সাথে 'ধর্ম' শব্দটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরও জড়িত ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষঙ্গ, রীতি, আচার, কৃত্য প্রভৃতি। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের পরিবেশনা দৃষ্টে এ সত্য বারবারই প্রমাণিত হয়। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আঙ্গিক আলকাপনাট্যে বন্দনাগীতের বিচিত্র ব্যবহার পরিদৃশ্যমান। এ নাট্যের পরিবেশনা শুরু হয় জয়ধ্বনি তোলার মধ্যদিয়ে। এই পর্বটিকে বলা হয় জয়বন্দনা।

জয়বন্দনা শুরু হয় সৃষ্টিকর্তা বা ভগবানের নাম স্মরণের মধ্য দিয়ে। এরপরে স্মরণ করা হয় নাট্যের দেবতা শিব নটরাজকে। তারপরে আসে মিঞা তানসেন, দেবী সরস্বতী, বিশ্বনাথ, নবী-রাসুল, পীর-পয়গম্বর, প্রবীণ আলকাপ সরকার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম। অবশেষে দেশ, দেশের জনগণ ও উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের নামে জয়ধ্বনি তোলার মধ্যদিয়ে শেষ হয় এই বন্দনাপর্ব। কর্ণসার্ট শেষ হলে সরকার দোহারবৃত্ত থেকে উঠে এসে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়ায়। এবার জয়ধ্বনি তুলে শুরু করেন জয়বন্দনা। জয় বন্দনার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো –

জয় জয় স্বর্গের দেবতা কি জয়.....॥

জয় জয় শিবনাথ কি জয়.....॥

জয় জয় মিঞা তানসেন কি জয়.....॥

জয় জয় শিব নটরাজ কি জয়.....॥

সরকার যখন এভাবে জয়বন্দনা শুরু করেন তখন দোহারবৃন্দ প্রত্যেক লাইন শেষের "জয়" অংশটি উচ্চস্বরে বারবার উচ্চারণ করে। জয়বন্দনার পর শুরু হয় আসরবন্দনা।

আসরবন্দনা

ধর্মীয় কৃত্যের অনুষঙ্গ রূপেই আসরবন্দনা পর্বটি বাংলা নাটকের পরিবেশনার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। যে মঞ্চ বা আসরে পুরো নাট্য প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে, সে মঞ্চ বা আসরকে শ্রদ্ধা জানানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। আসরবন্দনার মধ্য দিয়ে আসর, আসরে উপস্থিত দর্শক, অভিনেতা, কুশীলব সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়।

বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান অঞ্চলে প্রচলিত আদিবাসী নাটক 'চাকমা গেং খুলি'-এর পরিবেশনায় আমরা দেখি, নাট্যাভিনয়ের পূর্বেই তারা আসরের মাঝখানে একটি কুলা রেখে তাতে কিছু চাল ঢালে। সে চালের উপরে বসায় পানি ভর্তি একটি পিতলের পাত্র যা 'ঘট' নামে পরিচিত। সাধারণত নদীর পানি দিয়ে এ ঘট পূর্ণ করা হয়। এবার পানিভর্তি সে ঘটে রাখে কচি আমপাতা। কুলার তিন দিকে থাকে তিনটি প্রদীপ। এবার এই ঘটের সামনে আসন পেতে বসে অভিনেতা তার আসরবন্দনা পর্বটি শুরু করেন। উক্ত বন্দনা পর্বটি অভিনেতা কেবল গীতের সহযোগে পরিবেশন করে থাকেন। এতে কোন ধরনের নৃত্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না।

নাটোর অঞ্চলে প্রচলিত 'মাদার পীরের গানে'র আসরবন্দনায় দেখা যায়, মূল গায়েন বাদ্যের তালে তালে অন্ত্যমিলযুক্ত বর্ণনাত্মক পদ্যের ছন্দে বন্দনা পরিবেশন করেন। এ সময় দুজন নাচিয়ে তার দুপাশে অবস্থান নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন। উক্ত বন্দনাগীতের মাধ্যমে আল্লাহ্, রাসুল, পীর, দরবেশ, দেবী সরস্বতী, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, দেশ ও দশের উদ্দেশে সালাম জানানো হয়। যেমন –

এক অক্ষর, দুই অক্ষর যে জানে কালাম
তিনার আমার হাজার সালাম।
এক অক্ষর, দুই অক্ষর যে শেখালো মোরে
ভক্তি-ভাবে তাহার চরণ আমার মস্তকের উপায়।
দীক্ষা গুরু বন্দী, ছুঁকে শিক্ষা গুরুর উপরে।
গানের গুরু বন্দে গাবো স্বরসতী মা। (আশুতোষ, ২০০৩ : ১-২)

আলকাপনাট্যের আসরবন্দনা পর্বটিও সরকার নিজেই সম্পন্ন করে থাকেন। বাদকগণ বাদ্য বাজিয়ে এবং দোহার-গায়েন ধুয়া ধরে সহযোগিতা করে সহযোগিতা করে সরকারকে। আসরবন্দনায় প্রথম লাইনটি শুরু করেন সরকার, যা দোহার কণ্ঠে পৌনঃপুনিক গীত হয়। রাজশাহী জেলার নওহাটা উপজেলার পবা গ্রামের বাঁচার আশা নামক আলকাপ দল পরিবেশিত আসরবন্দনার অংশবিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হলো –

কুসুম শকালো শ্যামালো তরু
এনেছি দেব হে করিলাম শুরু ॥
পূজার থালায় আরতি জানাই
এনেছি দেব হে করিলাম শুরু।
পঞ্চফুলের গাঁথিয়া মালা

গলে পরাব হে করিলাম শুরু
তোমার পরাব হে করিলাম শুরু ।

পরিবেশনার স্থান ও আয়োজনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে আলকাপের আসরবন্দনার ভিন্নতা লক্ষ করা যায় । যেমন, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আসর বসলে সেখানে গাওয়া হয়–

বন্দি বীণাপাণি, বিদ্যায়িনী
শ্বেত সরস্বতী সরোজ বাসিনী
কণ্ঠে দে মা সুর লহরী
যন্ত্রে দে মা শব্দ মাধুরী
চিত্তে জ্বেলে দে জ্ঞানের প্রদীপ
বক্ষে শক্তি, জ্ঞান দায়িনী
বন্দি বীণাপাণি, বিদ্যায়িনী ॥
মন্দিরে তব আলোর বন্যা
বিশ্বমাতা স্বনাম ধন্যা
আমরা কজন করি নিবেদন
শ্রী চরণে রাখি মধুর বাণী
বন্দি বীণাপাণি, বিদ্যায়িনী ॥

উক্ত সরস্বতী বন্দনাটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলকাপ সরকার মাহ্‌বুব ইলিয়াস রচনা করেছেন, যিনি নিজে মুসলমান । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই দেখা যায় । মুসলমান সরকারের মাধ্যমে রচিত হয় সনাতন ধর্মের ছোঁয়াপুষ্ট আলকাপের বন্দনা সংগীত । আর এই বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সমাজ সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে উত্তীর্ণ করে একজন শিল্পীর মর্যাদায় ।

দেশবন্দনা

আসরবন্দনা শেষ করে দেশবন্দনা শুরু করেন সরকার । বন্দনার এ অংশে দেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন মধুর চরণ গীত হয় । যেমন-

ও হামার স্বদেশ বাংলা
রূপে রূপে অপরূপা শস্য শ্যামলা
তোর প্যাটে মা জনম লিনু
ছাতির তনের মধু পিনু

কোলের দোলে আঁচল পাইতা
নিদ পাড়ায়ে কি সুখ দিলা।
পূবে বন্দিনু হামি হিমাদ্রির শিখর
ভিজায় সে বাঙলার মাটি সে অবিনশ্বর
পশ্চিমে বন্দিনু যত ধর্ম-কর্ম-স্থান
সর্বকর্মে যায় যেথা বাঙলার সন্তান।
দক্ষিণে বন্দিনু মাগো বঙ্গোপসাগর
বাঙলার যত নদ-নদী বাইনছে সেথা ঘর।
(মিউজিক বাজে)

+												+
ধা	তেরে	কেটে	না	তেরে	কেটে	ধা	তেরে	কেটে	ধা
১	২	৩	১	২	৩	১	২	৩	১

(তেহাই)

ধা	ধা	ধা
১	১	১
থৈ	থৈ	থৈ

(আবার গান শুরু হয়)

দেশি-বিদেশি সওদাগর সেই সাগরে ভাসে
রূপালি মাছের টাকা হামাগো কতো কামে আসে
উপরে বন্দিনু মাগো চান তারা আসমান
যারা টিক্যা আছে জানি বায়ুতে ভাসমান।
সব শেষে বন্দিনু তোর
বারো কটি সন্তান
সুখে-দুঃখে গাহে যারা
রঙের আলকাপ গান
আরো বন্দিতাছি আমি
আল্লাহ-ভগবান।

এভাবেই দেশ-মাতৃকার বিভিন্ন গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় দেশবন্দনা। এরপর শুরু হয় ছোকরা নৃত্য।

ছোকরা নৃত্য

দেশবন্দনা শেষ করে সরকার পুনরায় বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে প্রবেশ করে। হঠাৎ করেই ছোকরাদের নিজেদের মধ্যে হালকা খুনসুটি শুরু হয়। সাথে যোগ হয় হাস্যরস। কে আগে নৃত্য পরিবেশন করবে তা নিয়েই এই হাস্য-রসের সৃষ্টি। নারীবেশী ছোকরারা মেয়েদের মতো করেই – আগে তুই যা, না না তুই আগে – এ ধরনের কথোপকথনের এক পর্যায়ে সবাই মিলে যেকোনো একজনকে অনেকটা জোর করে ধাক্কা মেরে মঞ্চের মাঝখানে ঠেলে দেয়। শুরু হয় ছোকরা নৃত্য।

নাচের শুরুতেই ছোকরা তার শাড়ির আঁচল এক টানে বাম কাঁধের ওপরে উঠিয়ে ফেলে। এতে পেট ও বুকের প্রায় অর্ধাংশ উন্মোচিত হয়। আস্তে আস্তে বাজতে থাকা সুর-লহরী এবার দ্বিগুণ লয়ে বাজতে থাকে। ক্রমে তা ঝংকার তোলে। ঝংকার ওঠে ছোকরার শরীরেও। সাথে যুক্ত হয় দর্শক-করতালি। এভাবেই সম্পন্ন হয় ছোকরা নৃত্য। এর স্থিতি নির্ভর করে দর্শকদের চাহিদার ওপরে।

নটরাজ নৃত্য

ছোকরা নৃত্যের পরবর্তী ধাপ নটরাজ নৃত্য। এ পর্বে একজন অভিনেতা দোহার বৃত্ত থেকে উঠে এসে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়ায়। দর্শকের দিকে পেছন ও দোহার বায়েনের দিকে সামনে ফিরে দাঁড়ায় সে। এরপর মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে দুহাত এক করে তাতে তোলে অঞ্জলি হস্তভেদ। এবার বাম পা ভূমিতে রেখে ডান পা টো-এর উপরে রাখে এবং তালে তালে বাম থেকে ডানে ও ডান থেকে বামে ঘোরে। এভাবে দু-আবর্ত ঘোরার পর মুদ্রা পরিবর্তিত হয়। নটরাজ নৃত্যের এই অংশকে বলা হয় বন্দনা পর্ব। এই নৃত্যাংশ দ্বারা অভিনেতা আসর, আসরে উপস্থিত দর্শক ও নটরাজ শিবকে প্রণাম জানায়।

নটরাজ নৃত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে অভিনেতা তার বাম হাতটাকে পতাকের মতো করে মুখের সামনে ধরে এবং ডান হাতটিকে পতাক মুদ্রা তুলে মাথার ডানদিকে রেখে হালকা নাড়াতে থাকে। গলা একবার সামনে, আরেকবার পেছনে নেয়। চোখে মুখে কখনো শান্তরস, কখনো আবার শৃঙ্গারের প্রভাব। মূলত মুখের সামনে ধরে রাখা বাম হাতটিকে তারা আয়না হিসেবে ব্যবহার করে এবং ডান হাতটি বারবার বামে-ডানে ঘুরিয়ে কেশ পরিচর্যার বিষয়টি তুলে ধরতে চায়।

নৃত্যের এই অংশে অভিনেতা যখন ডানদিক থেকে বাম দিকে ফেরে, তখন তার বাম পা ভূমিতে এবং ডান পা ভাঁজ করা থাকে ডান পায়ের হাঁটুর উপরে। তেমনি ভাবে

অভিনেতা যখন বাম দিক থেকে ডান দিকে ফেরে তার পায়ের অবস্থান থাকে পুরো বিপরীত। এই নৃত্যাংশ দ্বারা অভিনেতা নটরাজ শিবের কেশ পরিচর্যার বিষয়টি দর্শকদের সামনে তুলে ধরে।

নৃত্যের এক পর্যায়ে অভিনেতা দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে বসে। ডান হাত রেখে কোমর বরাবর এবং বাম হাত কাঁধের ওপরে ভাঁজ করা। অভিনেতা বাজনার তালে তালে কোমর দোলাতে দোলাতে ক্রমে দাঁড়ায় এবং পুনরায় বসে পড়ে। কোমর দোলানোর সময় প্রত্যেক বিটে বিটে ডান হাত দিয়ে কোমরে আলতো করে চাপড় মারে। ঠিক একই ভাবে দর্শকদের দিকে সামনে ফিরে আবার পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে।

এবার অভিনেতা মঞ্চের কেন্দ্র থেকে সরে এসে মঞ্চের ডানে অবস্থান নেয়। বাম পা মাটিতে রেখে ডান পায়ের হাঁটু গেড়ে বসে সে। এবার বাম হাতটি মাথার উপরে আর ডান হাতটি কোমর বরাবর মেলে ধরে। দুহাতেই শোভা পায় পতাক মুদ্রা। এই অবস্থানে থেকে সে চরকির মতো ঘুরতে থাকে। চোখে-মুখে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে শৃঙ্গার রস। এভাবেই নটরাজের বিভিন্ন ছলাকলা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় নটরাজ নৃত্যপর্ব।

খ্যামটা

আলকাপের অন্যতম আকর্ষণ খ্যামটা নৃত্য। ছোকরাদের এই খ্যামটা নৃত্য মূলত আসর জমানোর জন্য পরিবেশিত হয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য দর্শক মনকে চাঙ্গা করা। নৃত্যের শুরুতেই ছোকরা দোহারদের দিকে মুখ করে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে বসে। এবার ধীর লয় কিন্তু চড়া সুরে গান ধরে সে। সাথে যুক্ত হয় বাদন। খ্যামটা নৃত্য-গীতে আদিরসের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ছোকরা এবার তার হাত দুটোকে বুকের মাঝ বরাবর এনে তাতে তোলে আলাপদ্ম হস্তমুদ্রা। এবার ডানহাতে ভ্রমর মুদ্রা তুলে তা বারবার বাম হাতে তোলা পদ্মের উপরে ঘোরাতে থাকে। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

আমার বাগানে বন্ধু ফুল ফুইটাছে
ভ্রমরা সেই ফুলে ডানা মেলেছে।
আমার বাগানে বন্ধু ফুল ফুইটেছে
ভ্রমরা সেই ফুলের মধু লুইটেছে।
আমি নতুন বন্ধু ও নতুন
যমুনার জল সেও নতুন
আমি নতুন বন্ধও নতুন
যমুনার জল আরো নতুন।

নতুনে নতুনে খেলা মনেতে জাগিল
নতুনে নতুনে সই গো মিলন হইলো
ভ্রমরা গানের সুরের ডানা মেলিল ।

বন্ধু আমার আসবে বলে
হৃদয় দুয়ার রাখলাম খুলে
সারা নিশি জেগে আছি
তাহার আশাতে গো
ভ্রমরা গানের সুরে ডানা মেলিল ॥

একই আলকাপ আসরে একাধিক খ্যামটা পরিবেশিত হতে দেখা যায়; যেমন–

আমি রসের কথা কইবই
তোমার রসের কথা কইবই
কত্ত ভাবিলাম
দেখা দেওনা মনের কথা
মনেই রাখিলাম ।
আমি রসের কথা কইবই ॥

(মিউজিক)
এসো না বসো না বন্ধুরে আমার
যৌবন দিয়ে মন মজাব আজকে তোমার
এসো না থাকো না বন্ধুরে আমার
যৌবন দিয়ে মন মজাব আজকে তোমার ।
এসো না থাকো না বন্ধুরে আমার
যৌবন দিয়ে মন ভোলাব আজকে তোমার

[মিউজিক]
চারা গাছে ফুল ফুইটাছে আছে মধু ভরা
যেই না ফুলের মধু খেতে কে করেছে মানা
চারা গাছে ফুল ফুইটাছে আছে মধু ভরা
তুমি বন্ধু মুখে দিলে কে করিবে মানা

[মিউজিক]
একটু না হয় দেরি হলো (হায় রে হায়)
একটু না হয় দেরি হলো বাসর সাজাইতে
ভালোবাসা দেব তোমায় আজকে রাতে।
এসো না বসো না বন্ধুরে আমার
যৌবনের খেলা দেখাব আজকে তোমার।

ফার্স বা দ্বৈত সংগীত

আলকাপনাট্যের পরিবেশনায় ব্যবহৃত ফার্স বা দ্বৈত সংগীতগুলো অনেকটাই গীতিনাট্যধর্মী। এতে থাকে প্রশ্নোত্তর পর্ব, যেখানে নায়ক-নায়িকাকে অথবা নায়িকা-নায়ককে প্রশ্ন করে এবং অপরজন তার উত্তর দেয়। এরপর শুরু হয় গানে গানে তর্ক-বিতর্ক। এক পর্যায়ে তুমুল ঝগড়া। কিন্তু সঠিক যুক্তি তর্ক দাঁড় করিয়ে গানের মিলনাত্মক পরিসমাপ্তিই ঘটানো হয় শেষ পর্যন্ত। কখনো বর্ণনা, কখনো সংলাপ ও গান সহযোগে পরিবেশিত হয় এই দ্বৈত সংগীত। এমনই একটি দ্বৈত সংগীত নমুনা হিসেবে নিম্নে প্রদত্ত হলো :

লতা : আমার নাম লতিফা। তবে সবাই আমাকে ভালোবেসে লতা বলেই ডাকে। আমার মা নেই। তাই সংসারের সব কাজ আমাকেই করতে হয়। একদিন আমি জল আনতে গেছি নদীর ঘাটে। এমন সময় এই গ্রামেরই দুষ্টু ছেলে মোহন, দুষ্ট হলে কি হবে, দেখতে খুব সুন্দর, ও নদীর তীরে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল। আমাকে দেখেই দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর কি হলো ঘটনাটি শুনুন–

মোহন লতা তোমারে হেরিয়্যা
প্রাণে যাইগো মরিয়্যা
তুমি আমায় কথা দিলে
তোমায় করবো বিয়া

লতা সত্য যাইগো বলিয়া
তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলে
করবো তোমায় বিয়া

মোহন লতা তোমারে হেরিয়্যা
প্রাণে যাইগো মরিয়া
প্রশ্ন তিনটা কর
আমি যাইবো জবাব দিয়া

লতা হাটের আগে বিক্যায় কি
বলো না খুলিয়া
সত্য যাইগো বলিয়া
মোহন লতা তোমারে যাই বলিয়া
হাটের আগে বিকায় কথা
শুন মন দিয়া
তুমি শুন কান খুলিয়া
লতা না চাইতে কি পাওয়া যায় গো
বলো না খুলিয়া
সত্য যাই বলিয়া
মোহন লতা তোমারে যাই বলিয়া
না চাইতে পাই সালাম
শুন মন দিয়া
শুন কান খুলিয়া

এভাবেই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ফার্স এগিয়ে যায় পরিণতির দিকে।

ছড়াবন্দনা

ফার্স বা দ্বৈত সংগীত শেষ হলে সরকার মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছড়ার মতো অন্য এক ধরনের বন্দনা পাঠ শুরু করেন যা 'ছড়াবন্দনা' বা 'বন্দনাছড়া' নামে খ্যাত। ছড়াবন্দনা বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়। মূলত আলকাপের মূল আখ্যানের সাথে সঙ্গতি রেখে এই ছড়াগুলি রচনা করেন সরকার। যেমন 'আম পাড়া কাপ' আখ্যানের পরিবেশনায় আম নিয়ে রচিত ছড়াবন্দনা পরিবেশনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। আবার মুক্তিযুদ্ধ বা কোন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে রচিত আখ্যানের পরিবেশনায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত ছড়াবন্দনা পরিবেশিত হতে দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত কিছু ছড়াবন্দনার দৃষ্টান্তও উল্লেখ করছি।

আমের ছড়া : চল যাই আম বাগানে
কত জাতের আম ধইরেছে
আম্র বীথি বনে।
চৌধুরী বাগানে ফজলী আম
মহানন্দার ধারে
গোহিল বাড়ীর ঘাট পার হইলে

সামনে যাদুবপুরে ।
মহারাজপুরে মিয়া বাগান
পাওয়া যাবে গোপালভোগ আম
এবার বড় বাগানে চলো
সেখানে ক্ষিরসা আম ভালো ।
নানার জাতের পুঠি আছে
হাজার বাগানের পিছে
চলো যাই সুরমা-ফজলি কিনি
বাবুর বাগানে বৃন্দাবনী
কালিভোগ আর মোহনভোগ
ঘুঘুডিমি কাইয়্যা ডিমি
গোবরতলার মিঠা মোহিনী
ন্যাংড়া খলিফার বাগানে
আচার ভালো হয় দিলশার আমে
মধুচুসকি মানিক গংগা
আশ্বিনা সফেদা শান্তিভোগ
বোম্বাই খিরশা আর রাধাভোগ
কানসাট গেলে সস্তা পাবো
কুমড়াজালি আম কিনবো
মল্লিকপুরে চলো যাই
রাজভোগ আম পাওয়া যায় ।
রানী বিলাসী আম ভালো
রহনপুরে ট্রেনে চলো ।
সেখানে মকরমপুর ঘাটে
কাঞ্চনতলা আমের মাঠে
সস্তা আমের দশা দশা
চলো যাই মোনাকষা ।

মুক্তিযুদ্ধের ছড়া : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা
শুনেন যতো শ্রোতা
পিছের দিকে পইড়া আছে

আরো কিছু কথা ।
শুনেন যত শ্রোতা
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা ।

উনিশশো সত্তর সনে
এহিয়া খান নির্বাচন তো দিলো
মেলা ছোটে মেলা সিটে
আমিলিগ পাশ কইরা গেল ।

এহিয়া খান ক্ষম্‌তা ছাড়েনা
সল্যা করবারে ধরে বায়না
শেখ মুজিবর রহমান
এই সল্লার প্রধান ।

সকলে মিলে সল্লা করতে থাকে
বঙ্গভবনের সভাকক্ষে
এহিয়া সল্লা না করিয়া
সল্লাহ দিলো ভাঙ্গিয়া ।

পঁচিশ মার্চ রাইত বারোটার পর
সশস্ত্র পাঞ্জাবি অস্ত্র ধর
আগুন দেয় করে গোলাগুলি
মা বইনের ইজ্জতের বলি ।

হাজার হাজার গুলি ছোঁড়ে
নিরস্ত্র বাঙলির উপরে
হাজারো মানুষ সইরা যায়
হাজারো মানুষ মইরা যায়
পাঞ্জাবিরা এদেশ ভরে
অগো রাজত্ব কায়েম করে ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
এ সময় ধরলো দেশের হাল

দেখাইলো বাঙালিরে
সঠির পথের দিক।
রমনার রেসকোর্স ময়দানে
সাতই মার্চের ভাষণে
করলো স্বাধীনতার ঘোষণা
বাঙালির মনে জাগিল
স্বাধীন দেশের বাসনা।
স্বাধীনতার ফয়সালা
জয় বাংলা! জয় বাংলা।

ছিঁচকে চোরের ছড়া : আমার বাড়ি তিন পাহাড়ি কোটাল পুকুরে
বাংলা-ভারত দিনে রাইতে ব্যাড়াই চুরি করে।
কোটাল পুকুরে গো-দাদা, কোটাল পুকুরে।
বছরে তিন মাস চুরি করি
হাট বাজারে পকেট মারি
ভদ্দর লোকের পকেট মারি
গাঁও গিরামে সিঁধেল চুরি
হাট বাজারে চিটিং করি
ম্যালাই মাইর খাইনু সেদিন ঠগের পালায় পড়ে।
দাগাগো আমার বাড়ি কোটাল পুকুরে গো দাদা
কোটাল পুকুরে।

এছাড়াও রয়েছে মাছের ছড়া, পাখির ছড়া, ব্যাঙের বিয়ের ছড়া প্রভৃতি। ছড়াবন্দনার সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ও প্রাধান্য পেতে দেয়া যায়। যেমন – আধুনিক সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ ক্রমেই যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এই যান্ত্রিক সভ্যতার দোষ-গুণ নিয়ে বিশ্লেষণমূলক ছড়াবন্দনা পরিবেশন করে থাকে সরকার। আবার কোন অঞ্চল কোন জিনিসের জন্য বিখ্যাত তা নিয়েও রচিত হয়েছে বহু ছড়াবন্দনা। যেমন :

আমরা মনের সুখে
আলকাপ গান গাই ॥
ওরে কোন বা দেশের কিবা ভালো
বলি আমরা তাই ॥

ওরে মুজাফ্ফরের লিচু ভালো
যেমন দাঁড় ভাঙ্গানি আম
দিনাজপুরের চিরা ভালো
আরো ভাল জাম ॥
ওরে কুমিল্লাতে ভুট্টা ভালো
কিনতে পাওয়া যায়
ওরে রংপুরেতে আমড়া ভালো
বলেন গো সবাই ।
তাই বৈশাখ মাসে খেতে ভালো
লবণ দিয়ে জাম
তাই জৈষ্ঠী মাসে খেতে ভালো
পাকা পাকা আম ।
আষাঢ়ে খাইতে ভালো
রসের নানান পিঠা
শ্রাবণ মাসে খাইতে ভালো
শ্বশুর বাড়ির মিঠা ।
কার্তিকে জলপাই ভালো
আরো ভাল শুন
ঐ ফাগুন চৈত্র মাসে ফুটে
নানা বর্ণের ফুল ।
বাড়ির বাগান দেখতে ভালো
ফুটলে গাছে ফুল
আর নারী হয় দেখতে ভালো
থাকলে মাথায় চুল ।
তাই নারী মাথায় দেখতে ভালো
থোকা থোকা চুল ।
বাসর ঘরে দেখতে ভালো
বউ এর মুখ বাঁকা
রুটি পিঠা খাইতে ভালো

ভালো মিঠাই পিঠা।
নানা ভালো জানি আমার
নানি ভালো জানি
বেদের হাতে দেখতে ভালো
সাপ রানী নাগিনী
এই পর্যন্তই শেষ না
আমরা আরো অনেক জানি।
আমরা মনের সুখে
আলকাপ গান গাই
কোন বা দেশের কিবা ভালো
বলি শোনেন সবাই।

মূল আখ্যানের পরিবেশনা

সাধারণত গীতি-নৃত্য, ছন্দ বা ছড়ার তাৎক্ষণিক সৃজন প্রতিভা উপস্থাপনের সাথে সাথে বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয়ের সমন্বয় আলকাপের মূল আখ্যানের পরিবেশনারীতিতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নাট্যগুণসম্পন্ন আলকাপের এই পর্বটি হলো আলকাপের মূল পর্ব। একটি আলকাপ দলের অভিনেতা ও কলা-কুশলীদের অন্তত পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি আখ্যান আয়ত্তে থাকে। এগুলোর মধ্যে বহুল প্রচলিত কিছু পালা হলো :

১। আলাল দুলালের কাপ
২। রাজা হরিশচন্দ্রের কাপ
৩। চাষা ভদ্রের কাপ
৪। ঠক ও গেরস্তের কাপ
৫। দেবর-ভাবির কাপ
৬। ডোম ও ধোপার কাপ
৭। চামার-কামারে কাপ
৮। হিন্দু মুসলমানের কাপ
৯। ভাই-ভাই এর কাপ
১০। মামা-ভাগ্নের কাপ
১১। চন্দন-জোৎস্নার কাপ

১২। রেখা দেবীর কাপ
১৩। লক্ষ্মীর হাতে ভিক্ষার ঝুলি কাপ
১৪। সতী নারীর বনবাস কাপ
১৫। ছেলে-বাপের কাপ
১৬। শাশুড়ি বউ এর কাপ
১৭। কাঠুরের কাপ
১৮। আপন ছেলের কাপ
১৯। নানা নাতির কাপ
২০। ঘরের কথা বাইরে কাপ
২১। সর্ব বিষয়ক কাপ
২২। আমপারা কাপ
২৩। চোর ধরা কাপ
২৪। রাধা কৃষ্ণ কাপ
২৫। ননদ পূজার কাপ
২৬। সীতার সতীত্ব প্রমাণের কাপ
২৭। গোষ্ঠ বৃন্দা কাপ
২৮। ব্রাহ্মণ পূজা কাপ
২৯। লক্ষ্মীর বনবাস কাপ
৩০। গোলাবাজ মেলার কাপ
৩১। যুগল বিষ্ণু ঠাকুরের কাপ
৩২। রামলীলা কাপ
৩৩। ঠাকুর বাড়ির কাপ
৩৪। নাগরাজের কাপ
৩৫। পঁহাত চিক্যাস কাপ
৩৬। মুয়াজ্জিনের কাপ
৩৭। সাউজির কাপ প্রভৃতি

মূল পালাটি পরিবেশিত হয় শুদ্ধ বর্ণনা, সংলাপ, নৃত্য ও গীতের সমন্বয়ে। এক্ষেত্রে আলাদা কোন বর্ণনাকারী থাকে না। চরিত্র নিজেই কখনও কখনও নিজ ভূমিকা থেকে বের হয়ে এসে বর্ণনাকারী হয়ে যায়। আবার বর্ণনা শেষ করে নিজ চরিত্রের রূপ ধারণ করে। সাধারণত ছোকরারা নারী চরিত্রে, দোহারদের ভেতর থেকে কেউ পুরুষ

চরিত্রে এবং সরকার নিজেই অভিনয় করেন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায়। আলকাপের বহুল প্রচলিত আখ্যান 'সাউজির কাপ'-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো :

সাউজির পালা শুরু হয় অতি সাধারণ একটি ছেলের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। বর্ণনাদৃষ্টে জানা যায়, তার নাম ল্যালহা। ছেলেটি বুদ্ধিতে খাটো। তাই রোজগার করে খেতে পারে না। এ নিয়ে সারাদিনই স্ত্রীর সাথে তার ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। একদিন ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্ত্রী এতই ক্ষেপে যায় যে ল্যালহাকে সে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। অপরদিকে ঐ গ্রামেই সাউজি নামে অপর এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি মনে করেন তার বুদ্ধি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। এ নিয়ে স্ত্রীর সাথে তারও ঝগড়া বেঁধেই থাকে। সাউজি তখন পরীক্ষা করে দেখতে চায় আসলে কার মাথায় বুদ্ধি বেশি। তার স্ত্রীর মাথায় নাকি তার নিজের মাথায়। এখান থেকে পালা শুরু হয় :

সাউজি তোর কি হয়াছেরে, ল্যালহা। তুই হামার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস কেনে?

ল্যালহা হামার বউ হামাকে খেতে দেয় না। হামাকে আজ বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। সে বলে হামার নাকি বুদ্ধি কম।

সাউজি তো তুই চাল্‌হাক হবি?

ল্যালহা হামি তো ল্যালহা গো। হামি চাল্‌হাক হব কেমন করে?

সাউজি দেখলো একে দিয়েই তার কার্যসিদ্ধি হবে। তাই সাউজি ল্যালহাকে ডেকে এনে তার হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে বললো– তুই পূর্ব, পশ্চিম বা উত্তরে গিয়ে ওই টাকাটা খরচ করবি। কিন্তু ভুল করেও দক্ষিণ দিকে যাবি না বুললাম। এই কথা শুনে ল্যালহা ভাবলো হামি বোকা তাই আমাকে আরো বোকা বানাতে চাইছে সবাই। নিশ্চয়ই দক্ষিণ দিকে কিছু অপেক্ষা করছে। এই ভেবে সে সোজা দক্ষিণ দিকে রওনা হলো। রাস্তায় যেতে যেতে সে বারবার পকেট থেকে টাকাটা বের করে আর দেখে। টাকার দিকে তাকিয়ে ল্যালহা চিন্তায় পড়ে যায়। সে ভাবতে থাকে যে সাউজি কেন তাকে এই টাকা দিল। এমন সময় সাউজির স্ত্রী বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে অনেক আদর-সমাদর করে। অনেক কিছু খেতে দেয়।

ল্যালহা : খাওয়ার পরে হামার কিন্তু একখান পান চাই বৌদি।

সাউজির স্ত্রী : হামি এক্ষণি এনে দিচ্চি।

যেই না সাউজির বৌ পান সাজাতে গিয়েছে অমনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। সাউজির স্ত্রী এতে খুবই চিন্তায় পড়ে যায়। তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। সে ল্যালহাকে ধান রাখার জালার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এরপর সাউজি ঘরে এলে তার স্ত্রী

তাকেও খেতে দেয়। সাউজি খাওয়া শেষ করে পান চিবুতে চিবুতে ধানের জালার ভেতরে পানের পিক ফেলে চলে যায়। সাউজি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তার স্ত্রী ল্যালহাকে জালির ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসে। এরপর ল্যালহা আবার সাউজির দোকানে ফিরে যায়। সে টাকা ফেরত দিতে গেলে সাউজি তাকে জিজ্ঞেস করে –

সাউজি কিরে ল্যালহা? সারাদিনে তুই কিছুই খাসনি?

ল্যালহা অনেক কিছু খেয়েছি বাবু।

সাউজি বল দেখি কি কি খেলি?

ল্যালহা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছি গো দাদা। সাথে সাজানো পানও ছিল।

এরপর সে ঐ বাড়িতে কি কি ঘটেছে সব সাউজিকে বলে দেয়। সাউজি সব বুঝতে পারে। তাই পরদিন সে বিশ টাকা হাতে দিয়ে ল্যালহাকে আবার এ বাড়িতে পাঠায়। ল্যালহা এবার বিশ টাকা দেখিয়ে সাউজির স্ত্রীকে বলে –

ল্যালহা : হামার কাছে আজ আরো অনেক টাকা আছে। আজ হামি মাংস দিয়ে ভাত খাবোগো বৌদি। সাথে একটা পানও লাইগবে।

সাউজির স্ত্রী : হামি তোকে আজ মাংস দিয়েই ভাত খাওয়াবো ল্যালহা। খাওয়ার পরে পানও দিব তোকে।

ল্যালহাকে মাংস দিয়ে ভাত খাইয়ে যেই সাউজির স্ত্রী পান সাজাতে যায়, অমনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। সাউজির স্ত্রী এবার ল্যালহাকে বাড়ির সিলিং-এর উপরে লুকিয়ে রাখে। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বুদ্ধির পরীক্ষা নেয়ার ঘটনার মধ্য দিয়েই মূল আখ্যান পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ ধরনের আখ্যানগুলোতে একই সঙ্গে শুদ্ধ বর্ণনা, সংলাপ, সংগীত ও নৃত্য সহযোগে সমাজে সংঘটিত পারিবারিক জীবনের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যার উপস্থাপন হয় অত্যন্ত সাবলীল।

গোবিন্দ নাম উচ্চারণ

মূল আখ্যান শেষ হলে কখনও কখনও পুনরায় দুএকটি কার্স বা খ্যামটা নৃত্য পরিবেশিত হয়। সব শেষে আবার 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি ঘটে।

গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন সমস্যা অত্যন্ত তির্যক সংলাপ, গান, নৃত্য ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে তা সমাধানের পথনির্দেশ দেয়া আলকাপনাট্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের আসরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুক্তি-তর্ক হয়, ঝগড়া-বিবাদ হয়, এমনকি মারামারিও হতে দেখা যায়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত একটা সুন্দর ও মিলনাত্মক

পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয় পালা। কেননা, এ দেশের সাধারণ মানুষ মিলন পছন্দ করে, বিরহ নয়।

পরিশেষে আলকাপনাট্যের পরিবেশনা প্রসঙ্গে সার্বিক বৈশিষ্ট্য নিচে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হলো –

১. বর্তমান সময়ে আলকাপনাট্য যে রীতিতে পরিবেশিত সেখানে মধ্যযুগের প্রভাব পরিদৃশ্যমান। মধ্যযুগের নাট্যপরিবেশনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল দেব-বন্দনার মধ্যদিয়ে আখ্যানের পরিবেশনা শুরু করা। ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্য আলকাপের পরিবেশনায় এ রীতি আরো স্ব-মহিমায় প্রবহমান।

২. আলকাপনাট্যের পরিবেশনায় প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা বা জনগণের কথিত ভাষা ব্যবহৃত হয়। গীত, নৃত্য, শুদ্ধ সংলাপ ও বর্ণনা সহযোগে পরিবেশিত হয় এ নাট্য। নাট্যস্থিত গীত-নৃত্য পরিবেশিত হয় বাদ্যের সঙ্গতে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হারমনিয়াম, ডুগি, তবলা, জুড়ি, মন্দিরা, ঘুঙুর, ঢোল, খোল প্রভৃতি।

৩. সৃজিত মঞ্চ বা মিলনায়তনের মঞ্চে আলকাপনাট্য পরিবেশনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হলেও পরিবেশনের সরস ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে এর উপস্থাপন খোলা মঞ্চে হওয়াই শ্রেয়। সে মঞ্চক্ষেত্র বৃত্তাকার হোক বা চৌকোণ হোক।

৪. আলকাপনাট্য পরিবেশনের ইতিহাস নির্দিষ্ট কোন উৎসব পার্বণের সাথে জড়িত নয় । গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য বছরের যে কোনো সময়ে যে কোনো উৎসব উপলক্ষে আলকাপনাট্য পরিবেশনের আয়োজন করে থাকে।

৫. আলকাপনাট্য পরিবেশনায় তিন ধরনের নৃত্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়; এগুলো হলো – ক. ছোকরা নৃত্য, খ. খ্যামটা নৃত্য ও গ. নটরাজ নৃত্য।

৬. আলকাপনাট্য পরিবেশনায় তিন ধরনের গীতের পরিবেশন পরিলক্ষিত হয়; এগুলো হলো – ক. বন্দনাগীত, খ. দ্বৈত সঙ্গীত ও গ. আখ্যানস্থিত সঙ্গীত।

৭. উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ ও শুদ্ধ বর্ণনার সহযোগে আলকাপনাট্যের কাহিনি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। সাথে থাকে সঙ্গীত, নৃত্য ও ছড়া কাটাকাটির পর্ব।

টীকা

১. বেইজ মেকআপ হলো প্রাথমিক মেকআপ। বেইজ মেকআপ ব্যতীত চরিত্রানুগ মেকআপ গ্রহণ করা যায় না। বেইজ মেকআপ শেষ করেই বিভিন্ন চরিত্র রূপদানের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রানুগ মেকআপ নিতে হয়।

২. ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে আট প্রকার রসের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথমটিই হলো শৃঙ্গার। শৃঙ্গারের রঙ হলো শ্যামবর্ণ। দেবতা বিষ্ণু। এই রস রতিনামক স্থায়ীভাব

থেকে উদ্ভূত। এ রসের স্থান দুটি সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। শৃঙ্গার রস স্ত্রী-পুরুষ থেকে উৎপন্ন এবং উত্তম যুবাপুরুষের প্রকৃতিসম্পন্ন।

৩. 'ছোকরা' শব্দটি রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে 'ছেলে' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ। তবে আলকাপনাট্য-পরিবেশনার ক্ষেত্রে ছোকরা বলতে বোঝান হয় নারী বেশধারী পুরুষ অভিনেতা, যারা নাট্য-পরিবেশনায় নারী চরিত্রে অভিনয়সহ বিভিন্ন নৃত্যে অংশগ্রহণ করে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মাজহারুল ইসলাম তরু (২০০০)। *ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত : আলকাপ গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২. সেলিম আল দীন (২০১০)। *সেলিম আল দীন নাট্যসমগ্র-৫*, প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স

৩. তাসাদ্দক আহমদ (১৯৯৪)। *নবাবগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত গম্ভীরা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৪. হাবিবুর রহমান (১৯৮২)। *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৯)। সম্পাদিত *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, চতুর্থ মুদ্রণ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা

৬. গোপাল হালদার (১৯৭৪)। *ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য (২০০৩)। *বাংলার লোক সহিত্য*, চতুর্থ খণ্ড, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা

৮. সাইমন জাকারিয়া (২০০৮)। *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, এপ্রিল ২০০৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা